The Jahangirnagar Review, Part-C, Vol. XXXVI, No. 2, pp 25-40
ISSN 2306-3920, DOI :

সুবোধ ঘোষের *ভারত প্রেমকথা* : নারী সৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য

তাসনুমা জামান*

[**সার-সংক্ষেপ:** বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম প্রতিভাধর কথাসাহিত্যিক ও সাংবাদিক সুবোধ ঘোষ। তিনি তাঁর স্বকীয় শৈলী ও মৌলিক রচনাশক্তির মাধ্যমে পাঠকমনে এক অনুপম স্থান অধিকার করেছেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব যেমন আকস্মিক, তেমনি চমকপ্রদ। কল্লোল-পরবর্তী যুগের এই উজ্জ্বলতম প্রতিভা, নিজের বৈচিত্র্যময় জীবনানুভূতি এবং তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার সমন্বয়ে সৃষ্টি করেছেন অসংখ্য অনবদ্য সাহিত্যকর্ম। সুবোধ ঘোষের *ভারত প্রেমকথা* বাংলা কথাসাহিত্যের তেমনি এক সৃষ্টি, যেখানে *মহাভারতে*র বেশ কয়েকটি অপ্রচলিত উপাখ্যানকে নবতর চেতনায় পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থে লেখক মূল কাহিনির মর্মবস্তু অক্ষুণ্ন রেখেও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, মানবিক দ্বন্দ্ব এবং নারীর স্বাধীনচেতনাকে প্রাধান্য দিয়ে আলেখ্যের পুনর্ব্যাখ্যা করেছেন। এই গ্রন্থে নারীচরিত্রগুলোর বিশেষ চিত্রায়ণ ও তাদের চারিত্রিকস্বাতন্ত্র্যের বৈশিষ্ট্য গবেষণার দাবি রাখে। এই দাবিকে গুরুত্ব দিয়ে আলোচ্য গবেষণায় সুবোধ ঘোষের *ভারত প্রেমকথা*র নারীচরিত্র সৃষ্টির বিশেষত্ব ও তাদের আধুনিক প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।]

মহাকাব্য সাহিত্যের এমন এক শিল্পধারা, যেখানে বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে একটি জাতির ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শের প্রতিফলন ঘটে। ভারতীয় মহাকাব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য *মহাভারত*। এই মহাকাব্যে কুরু-পাণ্ডবের গল্পকে অতিক্রম করে ভারত উপমহাদেশের ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বের এক চিরন্তন ইতিহাসের বিবরণ রয়েছে, ফলে এই গ্রন্থ ইতিহাসের সারবত্তাকে ধারণ করে *মহাভারত* নাম ধারণ করেছে। এই প্রসঙ্গে Winternitz এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> It is only in a very restricted sense that we may speak of the *Mahabharata* as an epic and a poem. Indeed in a certain sense the *Mahabharata* is not one poetic production at all but rather a whole literature. (মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় ২০১৫ : ২৮৫)

*মহাভারতে*র বহমান কাহিনির মধ্যে যেমন রয়েছে ঘটনার ঠাস-বুনোট, তেমনি রয়েছে বিভিন্ন শ্রেণি, স্থান ও মানুষের জীবনচিত্র। অসংখ্য নারীপুরুষ তাদের স্বতন্ত্র জীবনবোধ, আবেগ ও অভিজ্ঞতা নিয়ে জড়িয়ে আছে এই মহাকাব্যের মূলধারায়, শাখা-প্রশাখায়, প্রতিটি কোণে। তাদের অনেকেই সময়, সমাজ, ভাগ্য ও জীবনের সঙ্গে এমন ভাবে সংঘাত করে উঠে দাঁড়িয়েছে, যেন তারা আজকের সময়ের মানুষেরই প্রতিচ্ছবি। *মহাভারতে*র সমাজব্যবস্থা পুরুষপ্রধান হলেও, এখানে নারীচরিত্ররা নিজস্ব অবস্থান ও পরিচয় সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। এ মহাকাব্যের প্রধান নারীচরিত্রদের জীবনদর্শন ও জগৎ সম্পর্কে নিজস্ব উপলব্ধি ও প্রজ্ঞা ছিল। তবে তারা ছাড়াও *মহাভারতে*র বিশাল কাহিনির আড়ালে এমন বহু নারীচরিত্র রয়েছে যারা স্বল্পচর্চিত হলেও নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। তারাও প্রেমে পড়েছে, সহ্য

* **তাসনুমা জামান :** সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

করেছে, প্রতিবাদ করেছে, সন্তান জন্ম দিয়েছে, সন্তান পালনের দায়ভার একাই বহন করেছে, সংগ্রাম করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। মহাকাব্যে এই নারীদের উপস্থিতি তাই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সুবোধ ঘোষ *মহাভারত*ের স্বল্পালোচিত বিশ জন নারীর উপাখ্যানকে মূল বক্তব্যের সঙ্গে নতুন ঘটনার কল্পনায় পুনর্গঠিত করে *ভারত প্রেমকথা*য় লিপিবদ্ধ করেছেন। কারণ তিনি মনে করেন, ক্লাসিক সাহিত্য ও শিল্পরীতির সঙ্গে অন্তরঙ্গ হওয়া জীবনের রূপকে নতুন ক'রে নিকটে পাওয়ার উপায়। (সুবোধ ঘোষ ১৪১৯ : মুখবন্ধ)। তাই প্রাচীন *মহাভারত*ের অনালোচিত বিভিন্ন নারীপুরুষের উপাখ্যানের মধ্যে লেখক আধুনিক জীবনের বৈশিষ্ট্যকে অনুসন্ধান করে নতুন-পুরাতনের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন।

বৈশ্বিক সাহিত্যিকদের রচনা বিশ্লেষণেও দেখা যায় যে, তাঁরা অনেকেই তাঁদের ঐতিহ্যবাহী ক্লাসিক-সাহিত্য হতে উপাদান সংগ্রহ করে স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে সেই বিষয়সমূহকে নতুনরূপে উপস্থাপন করেছের। বাংলা সাহিত্যে সুবোধ ঘোষের পূর্বেও অনেক সাহিত্যিক *মহাভারত* হতে বিভিন্ন উপাদানের বিচিত্র ব্যবহারে তার নবরূপায়ণ ঘটিয়েছেন। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের *শকুন্তলা*, *সীতার বনবাস*, মধুসূদন দত্তের *বীরাঙ্গনা কাব্য*, নবীনচন্দ্র সেনের *কুরুক্ষেত্র*, *রৈবতক*, *প্রভাস*, গিরিশচন্দ্র ঘোষের *পাণ্ডবগৌরব*, *জনা*, *পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস*, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের *নরনারায়ণ*, *ভীষ্ম*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *বাল্মীকির প্রতিভা*, *চিত্রাঙ্গদা*, *গান্ধারীর আবেদন*, *কর্ণকুন্তির সংবাদ*, *তপতী*, *প্রায়শ্চিত্ত*, *পরিত্রাণ*, *পতিতা* ইত্যাদি কাব্য, নাটক, কবিতার নাম। (অরিন্দম গোস্বামী ২০০১ : ২৩৮)। এসব রচনায় মহাকাব্যের বিভিন্ন কাহিনি নতুন দৃষ্টিকোণে ব্যাখ্যা লাভ করেছে। সুবোধ ঘোষও পূর্বজদের পথে ধাবিত হয়ে, ছোটোগল্পের ধারায় এই প্রাচীন কাব্যের কাহিনিসূত্রকে উৎস হিসেবে গ্রহণ করে, তার অবিকল অনুসরণ না করে, সৃজনশীলতায় সেগুলোর পুনর্বিন্যাস করেছেন। বাংলা গদ্যসাহিত্যে পুরাণের ব্যবহার অকিঞ্চিৎকর হওয়ায় সুবোধ ঘোষ এই মহাভারতীয় উপাখ্যানগুলো বাংলা ছোটোগল্পে আনয়ন করে প্রাতিস্বিক সাহিত্যব্যক্তিত্ব রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি নিজেই বলেছেন,

> বাংলা কথাসাহিত্যে পৌরাণিক তথা ক্লাসিক- এর রূপ ভাব কল্পনা ও মধুরতার নবরূপ দেখা যায়নি। একমাত্র নাট্যকারই এই দিক দিয়ে যা কিছু কাজ করেছেন। পৌরাণিক আখ্যায়িকা আধুনিক যুগের উপন্যাস ও ছোটগল্পের নামে দুই কথা শিল্পরীতির দ্বারা নবনির্মাণ লাভ করেনি। (সুবোধ ঘোষ ১৯৯৬ : ১২৩)

সুবোধ ঘোষ এই শূন্যতা পুরণে দক্ষতা দেখিয়েছেন। তিনি *মহাভারত*ের কয়েকটি আখ্যানকে মৌলিক পরিপ্রেক্ষিতে ও পরিবেশনায় আধুনিক চেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলে ধরেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে সুবোধ ঘোষের পুরাণ-নির্ভর ছোটোগল্পসমূহে নারীচরিত্রের স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করণের পাশাপাশি এসব উপাখ্যানে নারীচরিত্র চিত্রায়ণের ধরন, তাদের সামাজিক অবস্থানের বৈচিত্র্য ও গভীরতা, সর্বোপরি আধুনিক নারীর বৈশিষ্ট্যধারণে তাদের সাফল্য অনুসন্ধান করা হয়েছে।

সুবোধ ঘোষ যখন বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে প্রবেশ করেছেন তখন বিশ্বসাহিত্যসহ বাংলা সাহিত্যও আধুনিকতার মাইলফলক স্পর্শ করেছে। বিশ শতকের শুরুতে ফ্রয়েড মানবমনস্তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করে এমন এক তত্ত্বের অবতারণা করেন যার ফলে শিল্প, সাহিত্য ও সমগ্র মানবচিন্তার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা হয়। এছাড়াও দর্শনের নানাবিধ তত্ত্ব, উনিশ শতকে বাঙালির নবজাগরণের মুহূর্তে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বহিঃপ্রকাশে প্রচলিত মূল্যবোধ, সংস্কার, বিশ্বাস, যৌনবোধ এবং নারীপুরুষের সম্পর্কবিষয়ক চেনা ধারণাগুলো আমূল পাল্টে যায়। ফলে সাহিত্যিকগণ বহির্বাস্তবতা হতে সরে এসে মনোনিবেশ করেন ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক গভীরতা অনুসন্ধানে। সুবোধ ঘোষও প্রাচীন মহাকাব্য *মাহাভারত*ের বনপর্ব হতে 'পরীক্ষিৎ ও সুশোভনা' (অধ্যায় : ১২), 'ভাস্কর ও পৃথা' (অধ্যায় : ৩১৫), 'অগ্নি ও স্বাহা' (অধ্যায় : ২২৪), 'চ্যবন ও সুকন্যা' (অধ্যায় : ১২২),

উদ্‌যোগপর্ব হতে 'সুমুখ ও গুণকেশী' (অধ্যায় : ১০৪), 'গালব ও মাধবী' (অধ্যায় : ১১৫), শান্তিপর্ব হতে 'অতিরথ ও পিঙ্গলা' (অধ্যায় : ১৭৪), 'জনক ও সুলভা' (অধ্যায় : ৩২১), আদিপর্ব হতে 'মন্দপাল ও লপিতা' (অধ্যায় : ২২৯), 'সংবরণ ও তপতী' (অধ্যায় : ১৭১), 'বসুরাজ ও গিরিকা' (অধ্যায় : ৬৯), 'রুরু ও প্রমদ্বরা' (অধ্যায় : ০৯), 'ভৃগু ও পুলোমা' (অধ্যায় : ০৫), 'জরৎকারু ও অস্তিকা' (অধ্যায় : ১৩), অনুশাসনপর্ব হতে 'উতথ্য ও চান্দ্রেয়ী' (অধ্যায় : ১৫৪), 'দেবশর্মা ও রুচি' (অধ্যায় : ৪০), 'অষ্টাবক্র ও সুপ্রভা' (অধ্যায় : ১৯), সভাপর্ব হতে 'অনল ও ভাস্বতী' (অধ্যায় : ৩১), শল্যপর্ব হতে 'ইন্দ্র ও শ্রুবাবতী' (অধ্যায় : ৪৯) প্রভৃতি উপাখ্যানসমূহ আহরণ করে সেই কাহিনিসমূহে আধুনিক চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তাই আধুনিক অভিব্যক্তিকে ধারণ করে *ভারত প্রেমকথা* প্রকাশের সূচনালগ্ন হতেই বাংলার পাঠকমহলে আকর্ষণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। বিশেষ করে সুবোধ ঘোষ এই আখ্যানগুলোর নারী চরিত্রসমূহতে মানবিক আবেগের সার্বজনীনতার সঙ্গে আধুনিক সংবেদনশীলতাকে যুক্ত করে উপস্থাপন করেছেন। ফলে তাদের মধ্যে আবেগের নান্দনিকতা ও দার্শনিক স্তরের বিন্যাস বিদ্যমান। নিম্নের আলোচনাতে উল্লিখিত মন্তব্যের ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে। যেমন:

ভারত প্রেমকথা গল্প সংকলনের প্রথম গল্প 'পরিক্ষিৎ ও সুশোভনা' গল্পের নারী চরিত্র সুশোভনার মধ্যে নারীর চিরায়ত বৈশিষ্ট্য অপেক্ষা এক ভিন্নতর আচরণ লক্ষ করা যায়। *মহাভারতে* সুশোভনাকে দুঃশীলা ও কুস্বভবা বলে আখ্যায়িত করে সংক্ষিপ্ত পরিসরে তার কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। যেমন: 'সেই দুঃশীলা কুস্বভাববশতঃ পূর্ব্বে অন্যান্য অনেক ভূপতিকে বঞ্চনা করিয়াছে।' (কালীপ্রসন্ন সিংহ ২০২৪ : ৫৮৫)। কিন্তু সুবোধ ঘোষ সেই নির্মোক ভেঙে সুশোভনাকে ভিন্নরূপে দীপ্তিময় করেছেন। মণ্ডুক রাজা আয়ুর মেয়ে সুশোভনা পুরুষের মন নিয়ে খেলতে ভালোবাসে। রাজা আয়ু মেয়ের জন্য স্বয়ংবর সভার আয়োজন করতে চাইলেও সুশোভনা তাতে সম্মতি দেয়নি। তার এই আচরণ আয়ুর কাছে নারীধর্মের বিচ্যুতি। তাই সে মেয়ের আচরণে বিষণ্ন। অপর দিকে সুশোভনা পুরুষের হৃদয়ভাঙার খেলায় মেতেছে। নিজের পরিচয় গোপন করে সে প্রণয়ের ভান করে, প্রয়োজনমত নিজেকে সরিয়েও নেয়। তার এই কপট আচরণের কারণে একজন নৃপতি উন্মাদ হয়েছে, একজন হয়েছে বনবাসী। তাদের এই পরিণতি জেনেও সুশোভনার মনে কোনো আক্ষেপ নেই। এ যেন তার কাছে পুরুষচিত্ত বিজয়ের অভিযান। পুরুষের চোখের আকুতি তাকে আনন্দ দেয়। যেমন:

> এত আনন্দের মধ্যেও মাঝে মাঝে বড় ভয় করে প্রিয়া।
>
> – কীসের ভয়?
>
> – যদি তোমাকে কখনও হারাতে হয়, সে দুর্ভাগ্য জীবনে সহ্য করতে পারব না বোধহয়।
> সুশোভনার করপল্লব শিহরিত হয়, আনন্দের শিহরণ। প্রণয়ীর ভাষায় অন্তরের বেদনা ধ্বনিত হয়েছে। [...] অন্তর জয়ের অভিযান সফল হয়েছে সুশোভনার। (সুবোধ ঘোষ ১৪১৯ : ২১)

সমাজ নারীর নিকট হতে আশা করে প্রেমময় আচরণ, মোহনীয় রূপ। কষ্ট সহ্য করে নারী তার মুখের হাসিটি সবসময় ধরে রাখবে– এমন প্রত্যাশা নারীর প্রতি সমাজের। এর ব্যত্যয় ঘটলেই নারীর উপর অপযশ নেমে আসে। আবার পুরুষ একাধিক নারীতে আসক্ত হলেও সমাজের চোখে তা দোষের নয়। পুরুষ নারীর মন নিয়ে ছিনিমিনি খেললে তাকে ছলনাকারী হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয় না। কিন্তু কোনো নারী এ পথে গেলেই সমাজ তাতে বিপদের গন্ধ পায়, সেই নারী চিহ্নিত হয় ছলনাকারী রূপে। এই আচরণ আসলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সৃষ্টি। সুশোভনা এই পুরুষতন্ত্রের বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে। তাই তাকে ছলনাময়ী হিসেবে সম্ভাষণ করা হয়েছে। সুশোভনারও হৃদয় আছে, তা শুধু তার নিজস্ব। সে তার আপন মর্জির মালিক। পুরুষতন্ত্রের নির্ধারিত নারীর আচরণের সীমারেখা সুশোভনাকে

বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছে তার বাবা, এমনকি তার সাথীরাও। পুরুষ ও নারীর প্রতি সমাজের বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে সুশোভনা যেন জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড। যেমন:

> [...] প্রেমিকের প্রিয়া হও, বধু হও, গেহিণী হও।
> বিদ্রুপকুটিল দৃষ্টি তুলে সুশোভনা আবার প্রশ্ন করে– কি করে প্রিয়া-বধু-গেহিণী হতে হয় কিংকরী? তার কি কোনো নিয়ম আছে?
> – আছে
> – কি?
> – প্রেমিককে হৃদয় দান কর, প্রেমিকের কাছে সত্য হও।
> হেসে ফেলে সুশোভনা – আমার জীবনে হৃদয় নামে কোনো ভাবনা নেই সুবিনীতা। যা নেই, তা কেমন করে দান করব বল! (১৪১৯ : ২৩)

উল্লিখিত দৃষ্টান্তে সুশোভনার মনোভাব স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়েছে। যে হৃদয়ে প্রেম নেই, সে হৃদয় সে দান করতে চায় না। তার আচরণে কোনো কপটতা নেই। সে পুরুষের হৃদয় নিয়ে খেলা করে কারণ সমাজের পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের প্রতি এটা তার প্রতিবাদ। সে জানে যে পুরুষেরা আজ তার আসঙ্গে তৃপ্ত হতে চায়, তা শুধুই দেহজ কামনা হতে উদ্ভূত, তাতে হৃদয় উৎসারিত প্রেম নেই। সুশোভনা জানে, অনেক পুরুষই পোশাকের মত করে নারী বদল করে। নারী-পুরুষের সমন্বয়ে পরিবার, সমাজ গঠিত হলেও নারীর অবদান পরিবারে, সমাজে মূল্যায়িত হয় না। নারীকেও ছলনা, অবমাননার মুখোমুখি হতে হয়। সমাজের এই দ্বিচারী আচরণের বিরুদ্ধে সুশোভনার আচরণ যেন চপেটাঘাত। সুশোভনা নিজের অধিকার, নিজের সম্মানের বিষয়ে সচেতন। তাই সমালোচক তার সম্বন্ধে বলেছেন, ''পরীক্ষিৎ ও সুশোভনা' কাহিনির সুশোভনার চেয়ে অধিকতর মডার্ণ উয়োম্যান তো বাংলা সাহিত্যে দেখি নাই। শেষের কবিতার কেটি সিসি লিসির দল ও শেষ প্রশ্নের কমল তাহার কাছে নিস্প্রভ।' (প্রমথনাথ বিশী ১৪১৯ : মুখবন্ধ)

*মহাভারতে*র বনপর্বের ১৯২ নম্বর অধ্যায় হতে সংগৃহীত আলোচ্য গল্পটির সুশোভনা স্বাধীন ও দুর্বার। প্রকৃত প্রেমিক হৃদয়ের সন্ধানে ব্যপ্ত সুশোভনা ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা পরীক্ষিতের ভালোবাসায় শেষপর্যন্ত থিতু হয়েছে। পরীক্ষিতের সঙ্গেও সে ছলনা করার মাধ্যমে তাকে পরীক্ষা করেছে। পরীক্ষিতের গরম ও নরম আচরণ সর্বোপরি সুশোভনার প্রতি তার অকৃত্রিম ভালোবাসাই সুশোভনাকে পরাভূত করেছে। পরীক্ষিৎ তাকে সেই ভালোবাসা দিয়েছে, যা সে খুঁজে ফিরছিল।

আধুনিকতার অন্যতম যে বৈশিষ্ট্য ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ, তা সুশোভনার মধ্যে তীব্রভাবে বিরাজমান। যতোদিন সে প্রকৃত হৃদয়বানের সন্ধান পায়নি, ততোদিন সে প্রেমের ছলনায় পুরুষদের পরীক্ষা করেছে। তার এই পদ্ধতির সমালোচনা হতে পারে, কিন্তু তার আত্মসম্মানবোধ ও লড়াইয়ের স্পৃহা প্রশংসনীয়।

অধিকাংশ পুরুষের চোখে নারী ভোগের বস্তু। তাই তাদের মানদণ্ডে নারীর রূপ আগে ধরা দেয়। নারীর ভালোবাসার ক্ষমতাকে তারা আমলেই নেয় না। সমালোচকের মতে,

> পুরুষের একটা ক্ষুদ্র দম্ভ আছে। সে পয়সা উপার্জন করতে পারে বলিয়া মনে করে নারীর ভালোবাসা পয়সা দিয়াই কেনা যায় [...] সত্যকার ভালোবাসা পাওয়া কি দুর্লভ, কত বড় সৌভাগ্য, ইহার পর রূপে, বিদ্যায়, ধনে, বুদ্ধিতে নারীর যোগ্যতা বিচার করার মত মূঢ়তা কিছু হইতে পারেনা। (নীরদচন্দ্র চৌধুরী ১৪২৬ : ৯৭)

সুবোধ ঘোষ সুশোভনার মাধ্যমে পুরুষের এই দম্ভকে আঘাত করেছেন। পুরুষেরা নানাভাবে নারীকে পরীক্ষা করলেও *মহাভারতে*র সুশোভনা হাজার বছর আগেই পুরুষের হৃদয়কে পরীক্ষার মানদণ্ডে ফেলেছে। উনিশ শতকে বঙ্কিমচন্দ্রের বজ্রেশ্বর যেখানে বলেছে, 'মেয়ে মানুষকে পুরুষে ভয় করে এত

কখনো শুনি নাই। মেয়েমানুষ ত পুরুষের বাঁদী।' (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৯৯৯ : ৬২৫), সেখানে সুশোভনা বলে,

> [...] এক একজন মহাবল যশস্বী ও অতুল বৈভবগর্বে উদ্ধত নরপতি এই পদতললীন অলক্তে কমলগন্ধ বিধুর ভৃঙ্গের মত চুম্বন দানের জন্য লুটিয়ে পড়ে, পর মুহূর্তে সে উদ্‌ভ্রান্তের জন্য শুধু শূন্যতার কুহক পিছনে রেখে দিয়ে চিরকালের মত সরে আসে। (সুবোধ ঘোষ ১৪১৯ : ২৩)

পুরুষের এই অনাকাঙ্ক্ষিত দম্ভই সুশোভনার কাছে তাদের খেলার সামগ্রীতে পরিণত করেছে। নারী পুরুষের বাঁদী নয়, সহযাত্রী– এই বোধ বাঙালি সমাজ যেদিন হতে ভুলতে বসেছে, সেদিন হতে সমাজে অসামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়েছে। *মহাভারতে*র সুশোভনার সাহায্যে সুবোধ ঘোষ এই সামাজিক অসঙ্গতিকে আঘাত করেছেন। আধুনিক ব্যক্তিচেতনার বহিঃপ্রকাশে সুশোভনা তাই সমুজ্জ্বল।

আলোচ্য গ্রন্থে সুশোভনার বিপরীতে উপস্থিত হয়েছে গুণকেশী, পিঙ্গলা ও প্রমদ্বরা। তাদের মাধ্যমে চিত্রিত হয়েছে মানবজীবনের অন্যতম শাশ্বত প্রবৃত্তি প্রেম। সুশোভনার মত তারা কেউই প্রেমকে ব্যক্তিত্ব-চিহ্নিতকরণের মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করেনি। প্রেমের বিশুদ্ধ রূপই তারা ধারণ করেছে। প্রেমানুভূতির জীবনব্যঞ্জনায় তারা প্রত্যেকেই আলোড়িত। কারণ প্রেমের মধ্যে দেশ, জাতি, সময়ের কোনো সীমারেখা নেই। মানবচরিত্রের এই আবহমান গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ শিল্পী-সাহিত্যিকদের চেতনায় গভীরতা সৃষ্টি করার কারণে সুবোধ ঘোষও তাদের প্রেমের ব্যাপকতাকে তাঁর লব্ধ অভিজ্ঞতায় অনুভব করতে সক্ষম হয়েছেন। ফলে *মহাভারতে*র আলোচিত গুণকেশী, পিঙ্গলা ও প্রমদ্বরার প্রেম ও বিরহকে লেখক তাঁর আলোচ্য গল্পগ্রন্থে বিনির্মাণ করেছেন।

সুমুখ ও গুণকেশী গল্পে গুণকেশীর প্রেমজ শক্তিতে তার পরিণেতা সুমুখের ঘনিয়ে আসা মৃত্যুকে প্রতিহত করার কাহিনি লিপিবদ্ধ হয়েছে। সুমুখ ভোগবতীপুরীর চিকুরের পুত্র আর নাগ আর্যকের পৌত্র। অপরদিকে গুণকেশীর পিতা সুরপুরের রাজা মাতলি। মাতলি অনেক রাজ্য ঘুরেও মেয়ের জন্য যোগ্য পাত্র না পেয়ে বাসুকি রাজ্য ভোগবতী পুরীতে এসে সুমুখের সন্ধান পান। মেয়ের জন্য বিয়ের পাত্র হিসেবে সুমুখকে চাইলে তিনি জানতে পারেন তার আয়ু সীমিত কারণ গরুড় তাকে হত্যা করবে। গুণকেশীর অকালবৈধব্যের কথা স্মরণ করে আর্যক বিয়েতে রাজি না হলে মাতলি কথা দেয় দেবরাজ ইন্দ্রের সহায়তায় সে সুমুখের আয়ু রক্ষা করবে। তাই সে সুমুখকে নিয়ে তার রাজ্যে আগমন করে কন্যা গুণকেশীর হাতেই সুমুখের দেখভালের ভার সমর্পণ করে এবং সুমুখের ভবিতব্য সম্বন্ধে জানায়। তার পিতা ইন্দ্রের সহায়তায় গরুড়কে থামাতে না পারলে সে রাতেই সুমুখ মৃত্যুবরণ করবে জেনেও গুণকেশী তার প্রতি ভালোবাসায় আপ্লুত হয়। তার হৃদয়ের গভীরের সরসীতে ফুটে ওঠে সুমুখের মুখ। নিজের মনের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠে গুণকেশী। আরও বুঝতে পারে গুণকেশী, '[...] তার চক্ষু হতে বারিধারা ঝরে পড়ছে। এরই নাম বোধ হয় অশ্রু। [...] প্রেমের প্রথম উপহার কি এই অশ্রু?' (১৪১৯ : ৪৮)। কোমলমতি গুণকেশী প্রেমের অনুপ্রেরণায় বিদ্রোহী হয়ে ওঠে আর প্রশ্ন রাখে, 'এ কেমন বিষ্ণু আর এ কেমন তার কৃপা!' (১৪১৯ : ৪২)। গুণকেশী তার পিতার জন্য অপেক্ষা না করে সুমুখকে বাঁচাতে নিজেই অগ্রগামী হয়। নাগবৈরী গরুড়ের করাল নিশ্বাস শুনে মৃত্যুভয়ে ভীত সুমুখকে গুণকেশী সারারাত নিজের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ রাখে। অপবাদ পাবে জেনেও লোকলজ্জা ভুলে গুণকেশী সুমুখকে বাঁচাতে নিজের সম্ভ্রমকে বাজি রাখে। সুমুখকে হত্যা করার জন্য গরুড়ের কাছে ছিল একটি রাত, গুণকেশীর কারণে সে সুযোগ হারিয়ে সে রাগান্বিত হয়ে ওঠে এবং গুণকেশীকে ব্যভিচারিণী আখ্যা দিয়ে বিফলমনোরথে সরে যায়। সুমুখের সঙ্গে কথোপকথনে গুণকেশী জানতে পারে যে, সে তাকে বিয়ে করতে চায় অমৃত পাবার শর্তে। এটা জেনেও গুণকেশী তার সর্বস্ব দিয়ে তাকে বাঁচাতে এগিয়ে আসে। কারণ গুণকেশীর ভালোবাসা ছিল শর্তহীন। তাই অমৃত না পেলে সুমুখ চলে যেতে পারে

জেনেও গুণকেশী সুমুখকে আগলে রেখেছে। তার প্রেমানুভূতির স্পর্ধায় গরুড় জিঘাংসা পরাভূত হয়েছে। গল্পকার আলোচ্য গল্পে অসাধারণ নৈপুণ্যে একজন নারীর হৃদয়-উৎসারিত পবিত্র ভালোবাসার কাছে মৃত্যুর পরাজিত হওয়ার কাহিনি বর্ণনা করেছেন।

অতিরথ ও পিঙ্গলা গল্পে পুরাণ অনুসারে পিঙ্গলা অবন্তির একজন বারাঙ্গনা। তার বিশেষত্ব এই যে, পণ্যা হয়েও সে রাজা অতিরথকে ভালোবেসে তার উপলব্ধি রাজার কাছে ব্যক্ত করেছে। অনিন্দ্যসুন্দরী পিঙ্গলা রাজা অতিরথের ক্রোধান্বিত স্বরের কাছে নির্ভয়ে বলেছে, 'স্বরবীথিকাবাসিনী মদামোদমধুরা নারী আমি। মন যাকে চায় তাকে আহ্বান করার অধিকার আমার আছে।' (১৪১৯ : ৫৮)। নৃপতি অতিরথ তাকে প্রত্যাখ্যান করলে পিঙ্গলা তার চোখের আড়ালে চলে যায়। এক বছর পর পিঙ্গলার কথা স্মরণে এলে রাজা জানতে পারেন যে, সে তপস্বী হয়েছে। রচয়িতার এক আশ্চর্য শক্তিতে পিঙ্গলা সৃষ্টি, কারণ রাজা অতিরথের নিকট হতে প্রাপ্ত কূটভাষণে পিঙ্গলা দূরে সরে না গিয়ে রাজার আরও ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করতে পারত অথবা নূপুরের নিক্কণ ধ্বনি আর সুরের মূর্ছনায় রূপের আবহে ধনী কোনো পুরুষের বক্ষলগ্না হতে পারত। তা না করে সে তার ব্যক্তিকেন্দ্রীক প্রেমকে পরমাত্মার সন্ধানে ব্যপ্ত করেছে। পিঙ্গলা নির্দ্বিধায় প্রাচুর্যে ভরপুর জীবনকে পরিত্যাগ করে বেছে নিয়েছে তপস্বীর কঠোর জীবন। অতিরথের প্রত্যাখ্যানে পিঙ্গলা আহত হলেও ব্যর্থ প্রেমকে শক্তিতে রূপান্তরিত করে সে শক্তি দিয়ে সে ঈশ্বরকে খোঁজার সাহস করে। যে মধুস্বরা পিঙ্গলা সঙ্গীতের মাধ্যমে তার হৃদয়ের আহ্বান জানাত, সে পিঙ্গলার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়,

> তুমি আনন্দ, তুমি এক, তুমিই সর্ব। আর সব মিথ্যা। [...] মূঢ়া মানবী পিঙ্গলার সকল মোহ বিদূরিত কর প্রভু, জগতের একনাথ। তুমি প্রেম, তুমি আনন্দ, তুমি শান্তি, তুমি সর্ববাঞ্ছা, তুমি সর্বতৃপ্তি। তোমার প্রাপ্য পূজার ফুল মর্ত্যমানবের পায়ে নিবেদন করবার ভ্রান্তি হতে রক্ষা কর। (১৪১৯ : ৬১)

সব ছেড়ে দিয়ে যাকে পিঙ্গলা কামনা করেছিল সে তার জীবনে আসেনি, এতে সে ক্ষণিকের জন্য বাক্‌রুদ্ধ ও অচল হয়েছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে সে শান্ত হয়; হৃদয়ের জ্বলনকে নির্বাপিত করে তার ভস্মে সে নতুন করে নিজেকে উজ্জীবিত করে। সে নিজের মনকে প্রস্তুত করে এই বিশ্ব চরাচরের অধিপতির আনন্দময় প্রতিধ্বনি শোনার জন্য। পিঙ্গলা অনুভব করে জগদ্বীশ্বর তাকে আনন্দময় জীবনের ইঙ্গিত দিচ্ছেন। এই অনুভবে আবিষ্ট হয়ে পিঙ্গলা রত্নাভার সলীলপ্রবাহে নিক্ষেপ করে এক লহমাতেই অভিসারিকা হতে তপস্বিনীতে পরিণত হয়। জীবনের মোহমায়া আর তাকে আবদ্ধ করতে পারে না। তাই এক বছর পর রাজা অতিরথ তার প্রত্যাখ্যাত প্রেমকে ফিরিয়ে আনতে গেলে পিঙ্গলার নিকট হতে তাকে শুনতে হয় ঈশ্বরবন্দনা:

> তুমি একনাথ। তুমি শান্তি, তুমি আনন্দ, তুমি কাম্য, তুমি বন্দ্য। তুমি সকল দুঃখের শেষ, তুমি সকল সুখের শেষ। তুমি সকল হীনের সম্মান, তুমি সকল দীনের সম্পদ। চিনেছি তোমাকে চির চিন্ময় একনাথ। নিরঞ্জন করুণাঘন নিখিলেশ একনাথ– তুমি আমার, আমি তোমার। (১৪১৯ : ৬৬)

নিজেকে রূপান্তরের এই সাধনা পিঙ্গলাকে শক্তিরূপিনী হিসেবে চিহ্নিত করেছে। পিঙ্গলা ব্যক্তি-কামনা-সর্বস্ব প্রেম পরিত্যাগ করে স্রষ্টার প্রেমে নিমজ্জিত হয়ে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তা অনবদ্য।

ভারত প্রেমকথার আরও একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র প্রমদ্বরা। প্রমদ্বরার ঐকান্তিক ইচ্ছার কাছে হার মেনেছে রুরু দেহজ চাহিদা। ক্ষণস্থায়ী প্রেমে অভিষিক্ত হওয়ার জন্য রুরু কোনোভাবেই প্রমদ্বরাকে সম্মত করতে পারেনি। বরং আলোচ্য উপাখ্যানে রুরুর কামনাজাত ভ্রমরবৃত্তি প্রমদ্বরার একনিষ্ঠ তপস্যার কাছে পরাজিত হয়েছে। (অরিন্দম গোস্বামী ২০০১ : ২৪০)। সাধারণত পুরুষের

দাবির কাছে নারী নিজেকে সমর্পণ করলেও এই গল্পে প্রমদ্বরার কোমল কিন্তু দৃঢ় মানসিকতার কাছে রুরু সমার্পিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, *ভারত প্রেমকথা*র বিশটি গল্পের মধ্যে 'রুরু ও প্রমদ্বরা'ই একমাত্র গল্প যেখানে পুরুষ চরিত্র রুরু তার নিজের অর্ধায়ু দান করে সর্পদংশনে মৃতপ্রায় প্রমদ্বরাকে জীবন দান করেছে। প্রমদ্বরার ক্ষণপ্রণয়িনীর জীবন অপেক্ষা দয়িতার জীবনের প্রতি অদম্য আগ্রহই শেষপর্যন্ত রুরুর চিত্ত পরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা নিয়েছে। লোকবিধিশাসিত জীবনাকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রমদ্বরা নিজেকে সম্মানের স্থানে অধিষ্ঠিত করেছে।

*ভারত প্রেমকথা*র বিশেষ একটি নারী চরিত্র লোপামুদ্রা। একজন নারী নিজের সিদ্ধান্তে অটল থেকে নিজের মতো হওয়ার পথ সহজ নয়। লোপামুদ্রার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। 'অগস্ত্য ও লোপামুদ্রা' গল্পে লোপামুদ্রা ঋষি অগস্ত্যর মনে তার প্রতি প্রেমভাব জাগিয়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়ে তা বাস্তবায়ন করেছে। বিদর্ভ রাজতনয়া লোপামুদ্রা আনন্দপিয়াসী, নৃত্যমোদচঞ্চল, সুশোভিতা, অপরদিকে অগস্ত্য রিক্ত, নিঃস্ব ও চীরবাসসম্বল এক তপস্বী। তিনি বিদর্ভরাজার কাছে এসেছেন বহুকাল আগে রাজার দেওয়া প্রতিশ্রুতিকে পূর্ণতার পথে পরিচালিত করতে। লোপামুদ্রাকে অগস্ত্যর হাতে সমর্পণের জন্য রাজা ঋষির নিকট অঙ্গীকারবদ্ধ। অগস্ত্য লোপামুদ্রাকে বিয়ে করতে চান শুধুমাত্র পুত্রলাভের উদ্দেশ্যে। বংশ রক্ষার প্রয়োজনীয়তাই তার কাছে প্রাধান্য পেয়েছে, ভালোবাসা নয়। তাই লোপামুদ্রার রত্মাভরণ তার কাছে ভারবাহী মনে হয়। কারণ লোপামুদ্রার চম্পকতুল্য দেহশ্রীতে রত্মসম্ভার তাকে আরও মোহনীয় করে তোলে। তার এই সৌন্দর্য ঋষির মনে যেন প্রেমভাব উৎপন্ন করতে না পারে সে কারনে তিনি বার বার লোপামুদ্রাকে অলঙ্কার পরিত্যাগের নির্দেশ দিয়েছেন। লোপামুদ্রার সৌন্দর্য তার মনকে দুর্বল করেছে, কিন্তু ঋষি সেটা চান না। যেমন:

> লোপা আর্তস্বরে বলে– বিলাস সজ্জা নয় ঋষি।
> অগস্ত্য– তবে কি?
> লোপা– ঋষিরই প্রণয়প্রীতা এক প্রেমিকা নারীর হৃদয়ের উৎসবসজ্জা।
> অগস্ত্য বিস্ময় প্রকাশ করেন।– উৎসবসজ্জা ঋষির জীবনে উৎসবের প্রয়োজন নেই। [...]
> অগস্ত্য বলেন– ঋষি অগস্ত্যের পুত্রের মাতা হবে তুমি, একমাত্র এই ব্রত গ্রহণ করে আমার একমাত্র সংকল্প সত্য করে তুলবে। (১৪১৯ : ৫০)

উল্লিখিত দৃষ্টান্ত হতে জানা যায় যে, অগস্ত্যর জীবনে প্রণয়বিহ্বলতার কোনো স্থান নেই, স্ত্রী তার কাছে শুধু পুত্র উৎপাদনের মাধ্যম মাত্র। আর এই বোধ লোপামুদ্রার মনুষ্যসত্তায় আঘাত করেছে। সে স্বামীর চোখে তার প্রতি অনুরাগও দেখতে চায়। তাই, 'অশ্রু গোপন করবার জন্য মুখ ফিরিয়ে কিছুক্ষণ দাড়িয়ে থাকে লোপামুদ্রা। হ্যাঁ, তার কল্পনার সেই মধুর আতঙ্কের আতঙ্কটুকুই শুধু সত্য হয়েছে, আর মিথ্যা হয়ে গিয়েছে সব মধুরতা। বিদর্ভ রাজতনয়ার শুধু এই জীবন্ত দেহ নিয়ে গিয়ে তাঁর আশ্রমকুটিরে একটি সংকল্পের বস্তু করে রাখতে চাইছেন ঋষি।' (১৪১৯ : ৫১)। আর এখানেই লোপামুদ্রার বিদ্রোহ। সে সংকল্পের বস্তু হতে চায়না। সে তার সিদ্ধান্তে স্থির থেকে সকল অলংকার ত্যাগ করে প্রতিবাদ করেছে। অলংকার নিয়ে অগস্ত্যার সঙ্গে তাকে জড়িয়ে মিথ্যে অভিনয়ে লোপামুদ্রা ঋষির পৌরুষে আঘাত করেছে। ঋতুর পরিবর্তনে আশ্রমের প্রকৃতি সুন্দরভাবে সেজে উঠলেও অগস্ত্যবধূ লোপামুদ্রা প্রতিবাদস্বরূপ নিরাভরণই থেকে যায়। অগস্ত্যের প্রেমহীন আহ্বানে লোপামুদ্রা সাড়া দিলেও স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয় তার নির্লিপ্ততা। লোপামুদ্রার এই স্তব্ধতা শেষপর্যন্ত ঋষির দুয়ারবদ্ধ মনে কম্পন সৃষ্টি করে। অলংকারের কথা তুলে সে সেই কম্পনে আরও মাত্রা যোগ করে। লোপার নীরব প্রতিবাদ শেষপর্যন্ত অগস্ত্যের হৃদয়ে তার প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করলে লোপার মনোবাসনা পূর্ণতা পায়। লোপামুদ্রা পুত্র উৎপাদন ছাড়াও স্বামীর চোখে তার প্রতি যে প্রেম দেখতে চেয়েছিল, তা অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গে লোপামুদ্রা তার একগুঁয়ে মনোভাব ত্যাগ করেছে। সে রত্নলোভী নয়, শুধুমাত্র স্বামীর হৃদয়ে প্রেমানুভূতি

জাগ্রত করার জন্য সে অলংকারলোলুপের অভিনয় করেছে। লোপার বক্তব্যেই তা দৃষ্টিগোচর হয়, 'আমি রত্নলোলুপ নই ঋষি। [...] আমার ওষ্ঠপুটের স্মিতহাস্য দেখবার জন্য যে ঋষির হৃদয় আজ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, আমি তারই প্রেমিকা।' (১৪১৯ : ৫৪)। লোপামুদ্রা স্বীয় সম্মানকে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে দৃঢ় মনোভাব দেখিয়েছে তা তাকে বিশেষ করে তুলেছে। লোপামুদ্রা ঋষি অগস্ত্যকে নিজের উদ্দেশ্যে নিবেদিত করাতে পেরেছে। সেই সঙ্গে অগস্ত্যের সমাজ-ধর্ম শাসিত ভাবনাকে রূপান্তর করে প্রেমের নান্দনিকতার উদ্ভাসনে ব্যক্তিহৃদয়কে আলোকিত করেছে। লোপামুদ্রার অনিন্দ্য প্রত্যয় বর্তমানের পাঠককেও আলোড়িত করে।

আলোচ্য গল্পগ্রন্থে আরও একজন আত্মপ্রত্যয়ী নারী শ্রুবাবতী। সে মর্ত্যের মানবী হয়ে স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রকে পেতে চায় মর্ত্যলোকেই। কিন্তু স্বর্গাধীশ ইন্দ্রের পক্ষে নিজের অস্তিত্বের অহংকার ভোলা সম্ভব নয়। তিনি মনে করেন. 'মর্ত্যের প্রতীক্ষার টানে স্বর্গ কাছে নেমে আসেনা।' তিনি শ্রুবাবতীকে অনুগ্রহ করতে পারেন, কিন্তু প্রেম কদাপি নয়। তাঁর বক্তব্যেই তা স্পষ্ট:

> শ্রুবাবতী মুখ তুলে তাকায়– অনুগ্রহ?
> ইন্দ্র– হ্যাঁ ঋষিতনয়া, স্বর্গ শুধু এই মর্ত্যকে করুণা করতে পারে, অনুগ্রহ করতে পারে, বর দান করতে পারে। তার বেশি কিছু পারেনা। তার বেশি কিছু চাইবার অধিকারও এই মর্ত্যের কোনো প্রেম প্রণয় ও কামনার নেই। (১৪১৯ : ২৩৮)

দেবরাজ ইন্দ্রের এই উক্তি সমাজস্থ শ্রেণিবৈষম্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। *ইন্দ্র ও শ্রুবাবতী* গল্পের শ্রুবাবতী আপন চেতনায় ভাস্বর। ইন্দ্রের অপমান, স্বর্গপ্রাপ্তির লোভ তাকে টলাতে ব্যর্থ হয়। শ্রুবাবতী তার প্রেমের মাধ্যমে স্বর্গাপতি ইন্দ্রকে এই ধূলিময় পৃথিবীতেই পেতে চায়। তার কাছে স্বর্গের চেয়েও অধিক আকর্ষণীয় মর্ত্য। তাই ইন্দ্রের স্বর্গদানের প্রস্তাব সে অনায়াসে ফিরিয়ে দেয়। যেমন:

> শ্রুবাবতী বলে– আমার মৃত্যুর পর এই মর্ত্যনারীর ইহজীবনের অন্তে স্বর্গবাসী যে বাসব আমার বরসাল্য গ্রহণ করবেন বলে আশ্বাস দান করেছেন, সে বাসব আমার বাসব নয়। [...] চাই না স্বর্গ, স্বর্গাধীশকেও চাই না, আমি আমার মর্ত্যের বনবীথিকার বাসবকে ভালোবাসি। (১৪১৯ : ২৪৪)

যদিও *মহাভারতে*র শ্রুবাবতী আজ্ঞাপালনকারী এবং দেবরাজ ইন্দ্রের স্ত্রী হওয়ার অভিপ্রায়ে তাকে তপস্বা করতে দেখা যায়। যেমন: 'শ্রুবাবতী নামে অসামান্যা রূপলাবণ্যবতী কৌমার-ব্রহ্মচারিণী কন্যা দেবরাজের পত্নী হইবার অভিলাষে স্ত্রীজনের দুষ্কর বিবিধ তীব্র নিয়মানুষ্ঠান-পূর্ব্বক কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন।' (কালীপ্রসন্ন সিংহ ২০২৪ : ৫০৬)। কিন্তু সুবোধ ঘোষের সৃষ্ট শ্রুবাবতী আপনবোধে বিশ্বাসী এক লৌহমানবী। তার মাথা নত করানো এত সহজ নয়। তাই ঋষি বশিষ্ঠের ছদ্মাবেশে ইন্দ্র ছলনায় তাকে হারাতে চাইলে শ্রুবাবতী পাঁচটি ক্ষুদ্র বদরিকা বা কুল রান্নার পরীক্ষায় নিজের শরীর আহুতি দিয়ে রান্না সম্পন্ন করতে চায়। শ্রুবাবতীর এই নির্ভীক পদক্ষেপে মর্ত্য জিতে যায় স্বর্গের কাছে। কারণ তার ব্যক্তিত্বের প্রগাঢ় সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে ইন্দ্র পুনরায় স্বর্গ হতে মর্ত্যে তার কাছে ফিরে আসে এবং তার প্রেমকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

> বাসব বলেন– একটি কথা বলতে এসেছি, শ্রুবাবতী।
> শ্রুবাবতী– কী?
> বাসব– আমি ভালোবাসি। (সুবোধ ঘোষ ১৪১৯ : ২৪৭)

শ্রুবাবতী নিজ শর্তে সুস্থিত থেকে অভিপ্রায় পূর্ণ করার মাধ্যমে ভারত *প্রেমকথায়* স্বমহিমায় বিরাজমান। তার মতো আত্মপ্রত্যয়ী নারী আজকের আধুনিক সমাজেও বিরলদর্শন। শ্রুবাবতী চারিত্রশক্তির বিদ্যুৎদীপ্তিতে দেদীপ্যমান এক নারী।

আত্মমর্যাদায় অধিষ্ঠিত এবং প্রতিবাদে সোচ্চার কণ্ঠস্বর শোনা যায় *অনল ও ভাস্বতী* গল্পের ভাস্বতীর মাধ্যমে। মাহিষ্মতী রাজ্যের রাজা নীলের কন্যা ভাস্বতী। নিজের রাজ্যকে সহদেবের আগ্রাসন হতে রক্ষা করায় ভাস্বতী অনল দেবের চলাচলের পথে পুষ্প অর্পণ করে। এছাড়াও তার উদ্দেশ্য ছিল অনল দেবের চোখে সে তার প্রতি ভালোবাসা দেখতে পাবে। কিন্তু অনল তার প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করতে অসমর্থ হলে ভাস্বতী নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে অনলের আশা ত্যাগ করে। কারণ, ভাস্বতী, 'দুটি মুগ্ধ পুরুষনয়নের অনুরাগিণী। তার চেতনায় রয়েছে, 'মন চায়, তারই কণ্ঠে বরমাল্য দান করি, যে নীলতনয়া ভাস্বতীর মুখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে যাবে' (১৪১৯ : ১৫৮)– এই বোধ। ফলে অনলের একবার প্রত্যাখানেই ভাস্বতী তার আশা ত্যাগ করেছে। এই আচরণই ভাস্বতীর আত্মসম্মানকে নির্দেশ করে। ভাস্বতীকে ক্রীড়ানক মনে করে সুবর্চারূপী অনল তাকে প্রেম নিবেদন করলে সেই সময়ে ভাস্বতী তাকে গ্রহণ করলেও পরবর্তীকালে স্বরূপে আবির্ভূত অনলকে ভাস্বতী কোনোভাবেই মেনে নেয় না। সে তীক্ষ্ম কণ্ঠে বলে ওঠে, 'তুমি অনল, তুমি শুধু অনল, জ্বালালীলাবিলাসী অনল। তুমি সুবর্চা নও।' (১৪১৯ : ১৬২)। এই ঘটনা তার প্রতিবাদী সত্তারই বহিঃপ্রকাশ। এছাড়াও সুবর্চাকে তার পিতা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানালে তারও বিরোধীতা করে ভাস্বতী।

ভাস্বতী অনলের ছলনাকেও মেনে নিতে পারেনি। ফলে ভাস্বতীর মন না পেয়ে অনলকে এর মূল্য চোকাতে হয়েছে। বিয়ের কারণে অনল তার বাসনা চরিতার্থ করেছে ঠিকই, কিন্তু সে ভাস্বতীর হৃদয় পায়নি। ভাস্বতী শেষ পর্যন্ত প্রতিবাদ জারি রেখেছে। সে দৃঢ় প্রত্যয়ে ব্যক্ত করেছে:

> ভাস্বতীর মন আপনাকে বরণ করেনি, অনলদেব। [...] ভাস্বতীর মন কখনও আপনার বক্ষের নিকট যাবে না। আপনার কামনার জ্বালা চিরকাল নিরবে সহ্য করবে ভাস্বতীর দেহ, কিন্তু ভাস্বতীর মন চিরকাল তার স্বপ্নচারী প্রেমিক সুবর্চার বুকে লুটিয়ে থাকবে। (১৪১৯ : ১৬৪)

প্রথমে অনলের প্রত্যাখ্যান এবং পরে তার ছলনা ভাস্বতীর ব্যক্তিত্বে আঘাত হেনেছে বলেই সুবর্চা ও অনল একই ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও ভাস্বতী তাকে মেনে নিতে পারেনি। 'এস অনল, আমার জীবনের একমাত্র প্রেমিক সেই সুবর্চার রূপ নিয়ে আমার জীবনে চিরসঙ্গী হয়ে থাকে।' (১৪১৯ : ১৬৩)– এই অনুভবের প্রজ্জ্বলিত শিখাবাহী। ভাস্বতীর দৃঢ় মানসিকতার কাছে হার মানতে হয়েছে সর্বশুচি বৈশ্বানরকে।

চ্যবন ও সুকন্যা গল্পের সুকন্যাও ভাস্বতীর মতো বিদ্রোহী রূপে আবির্ভূত হয়েছে। তবে সুকন্যার মধ্যে ক্ষমা করার মনোভাব রয়েছে যা ভাস্বতীতে অনুপস্থিত। ভৃগু মুনির পুত্র চ্যবন প্রবীণ, জরাগ্রস্থ হয়েও শর্যাতিকন্যা সুকন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে প্রেম নিবেদন করলে সুকন্যা ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখ্যান করে। একজন ঋষির আহ্বান প্রত্যাখ্যানের সাহস সকলের থাকে না। অথচ সুকন্যা দৃঢ়চিত্তে সেই সাহসের কাজই করেছে। চব্যনের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে সে বলেছে:

> – আমার অনুরাগ চূর্ণ করার শক্তি নেই আপনার। ঘৃণ্য আপনার প্রস্তাব।
> – ঘৃণ্য? ক্রোধোদ্দীপ্ত স্বরে চিৎকার ক'রে প্রশ্ন করেন চ্যবন। [...]
> – একবার তাকিয়ে দেখ আমার দিকে।
> – দেখেছি।
> – ক্রোধাদ্দীপ্ত দুটি চক্ষু।
> – দেখতে ভয় করেনা?
> – দেখতে ঘৃণা বোধ করি। (১৪১৯ : ১৭৬)

পুরুষের পরাশক্তির কারণে সুকন্যা শেষ পর্যন্ত তার উপেক্ষাকে ধরে রাখতে না পেরে নিজ রাজ্যকে বাঁচাতে চ্যবনকে স্বামীরূপে গ্রহণ করতে বাধ্য হলেও চ্যবনের উদ্দেশে তার ঘৃণা বহমান ছিল। তার

জীবনে রেবন্ত এলে চ্যবনকে ত্যাগের সুযোগ পেয়েও সুকন্যা তাকে ক্ষমা করে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছে। মূল *মহাভারতে* চ্যবনকে পরবর্তীকালে জরাগ্রস্তহীন অবস্থায় উপস্থাপনে সুকন্যাপ্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে। যেমন: 'আমি বৃদ্ধ ও জরাগ্রস্ত ছিলাম। আপনারা আমাকে রূপযৌবনসম্পন্ন করিলেন এবং আমি আপন ভার্য্যাকেও প্রাপ্ত হইলাম।' (কালীপ্রসন্ন সিংহ ২০২৪ : ৩০২)। কিন্তু সুবোধ ঘোষ এই বক্তব্য তাঁর গল্পে এড়িয়েছেন। তিনি চ্যবনকে বৃদ্ধ রেখেই সুকন্যার মনোভাব পরীক্ষা করেছেন এবং সুকন্যা এতে উত্তীর্ণ হয়েছে। কারণ সুকন্যা আত্মপ্রেমী নয়, আত্মসম্মানের অধিকারী ও সাহসী। তাই চ্যবন তার উপর মানসিক অত্যাচার করলেও সুকন্যা তাকে শাস্তি দেওয়ার সুযোগ পেয়েও তার বাস্তবায়ন ঘটায়নি। তাই সাহস আর ক্ষমার অনবদ্য মিশেলে সৃষ্ট সুকন্যা উজ্জ্বলতায় মূর্ত। ভাস্বতী ও সুকন্যা উভয়েই সৌন্দর্যে, মাধুর্যে, স্বাধীনতায়, তেজে মহাভারতের মুক্ত নারীসমাজের প্রতিনিধিত্বকারী।

পুরুষতন্ত্রের প্রতি প্রতিবাদের ভিন্নরূপ লক্ষ করা যায় *গালব ও মাধবী* গল্পে। মাধবীর পিতা যযাতি দানের মাধ্যমে পুণ্য অর্জন করে স্বর্গলোকে মর্যাদায় আসীন হতে চান। অপরদিকে ঋষি বিশ্বামিত্রের প্রিয় শিষ্য গালব গুরুঋণ পরিশোধ করে জ্ঞানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে আগ্রহী। তারা দুজনই তাদের চাহিদাকে পূর্ণতা প্রদানের জন্য মাধবীকে হাড়িকাঠে উপনিত করেছে। যযাতি দান করতে জানে, কিন্তু কোন পথে দান করলে যথার্থ পুণ্য অর্জন হয় তা তার অজানা। গালব জ্ঞানী হতে চায়, অথচ জানে না নারীর অবমাননা ব্যক্তির মান প্রতিষ্ঠার অন্তরায়। সম্মান লাভের আশায় যযাতি নিজ কন্যা মাধবীকে গালবের হাতে সমর্পণ করে, গালব গুরুদক্ষিণা প্রদানের উদ্দেশ্যে তাকে অস্থেয় বিবাহের মাধ্যমে তিনজন নৃপতি ও একজন রাজর্ষির অঙ্কশায়িনী করে পুত্র উৎপাদনে বাধ্য করে এবং মাধবীর মাধ্যমে তাদের নিকট হতে গালব গুরুর দাবিকৃত দক্ষিণা আদায় করে। যযাতিকন্যার এই ভয়ংকর আত্মদানে গালবের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলে সে তাকে তার পিতৃগৃহে প্রত্যর্পণ করে চলে যায়। অকৃতজ্ঞ গালব একটিবারের জন্যও মাধবীর অমিতনয়নশ্রীর পানে ফিরে তাকায় না। পিতৃতন্ত্রের এই জঘন্য আচরণের বিরূদ্ধে সরাসরি প্রতিবাদ না করে মাধবী এর বিচারের ভার ছেড়ে দেয় প্রকৃতির উপর এবং নিজে বেছে নেয় তপস্বীর জীবন। প্রকৃতপন্থায় গালবকে দান না করার কারণে যযাতি স্বর্গ হতে বিতাড়িত হয়, তার প্রতি ধিক্কার ধ্বনিত হয় তারই রাজ্যে। আর মাধবী নিজের পুণ্য দান করে পিতাকে পুনরায় স্বর্গে পাঠিয়ে তার প্রতি ঘটে যাওয়া অন্যায়ের নিরব প্রতিবাদ করে। অপর দিকে গালবও মাধবীকে গ্রহণ না করে অশান্তির চিতায় জ্বলেছে। মাধবীকে পাওয়ার লক্ষ্যে যযাতির দরবারে এসে সে জানতে পারে, তার জন্য গ্রথিত বরমাল্য ছিড়ে ফেলে মাধবী তপস্বী হয়েছে, তার দেখা গালব আর কখনোই পাবে না। গালবের হৃদয়ে অশান্তির আগুন জ্বেলে দিয়ে মাধবী তার অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করে। আলোচ্য গল্পে মাধবীর মাধ্যমে নারীর প্রতি পিতৃতন্ত্রের অবমাননা এবং নারীর ক্ষোভ উদগীরণের মাত্রিকতা ভিন্নভাবে প্রকাশ লাভ করেছে। মাধবী তাপসিকা হয়ে তার অন্তরের নিভৃতে এক পরম শান্ত সত্তার সাক্ষাত লাভ করেছে।

স্বার্থত্যাগের মহিমায় আলোকিত হয়েছে *জরৎকারু ও অস্তিকা* গল্পের অস্তিকা চরিত্রটি। নাগরাজ বাসুকির বোন অস্তিকা তার জাতিকে বাঁচানোর চিন্তায় ব্যাকুল, কারণ রাজা জনমেজয় সমগ্র নাগজাতিকে ধ্বংস করতে উন্মুখ। অপরদিকে যাযাবর বংশের দ্বিতীয় পুরুষ জরৎকারু। কঠোর ব্রতপালনকারী তাপস জরৎকারু তপস্যার কারণে বিয়ে না করায় তাঁর বংশে কোনো উত্তরাধিকারী জন্মায়নি। বংশলোপের আশঙ্কায় তাঁর পিতৃসমাজ তাঁকে গৃহী হতে অনুরোধ করলে জরৎকারু শর্ত দেয় যে, তাঁর সমনাম্নী কোনো নারী যদি স্বেচ্ছায় তাঁর জীবনে এসে সন্তান ধারণ করতে চায় তবে তিনি তার অভিপ্রায় পূরণ করবেন। ব্রহ্মাচারী জরৎকারুকে রাজা জনমেজয় অত্যন্ত সম্মান করেন এবং ঘোষণা দেন যে, জরৎকারুর সন্তানকে তিনি মন্ত্রগুরু রূপে গ্রহণ করবেন। জনমেজয়ের এই বক্তব্যে বাসুকি নিজের বোনকে জরৎকারুর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তার সন্তানের মাধ্যমে নাগজাতিকে বাঁচানোর চিন্তা করে।

অস্তিকার কৌলেয় নাম জরৎকারু হওয়ায় ব্রতচারী জরৎকারুর শর্তও এত পূরণ হয় । অস্তিকা নিজ সমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছয় জরৎকারুর পাণি গ্রহণ করতে অগ্রগামী হয়ে স্বীয় কর্তব্য পালন করতে চায়। তার বক্তব্যেই তা সুস্পষ্ট, যেমনঃ 'জাতিকে সমূহ বিনাস হতে রক্ষা করবার কোনো উপায় যখন আর নেই, তখন আমার মত নারীর পক্ষে যা সাধ্য আমি তাই করতে চাই।' (সুবোধ ঘোষ ১৪১৯ : ১৮৬)

জরৎকারুর মতো প্রায়বৃদ্ধ, সংসারবিমুখ ও দরিদ্র এক তপস্বীর সন্তান ধারণের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে অস্তিকা নিজেরই বলিদান করেছে। কারণ এই বিবাহে হৃদয়ের কোনো স্থান ছিল না, ছিল কেবল স্বার্থ রক্ষার তাগিদ। তাই বিবাহ পরবর্তীকালে অস্তিকা স্বামীর ভালোবাসাময় স্পর্শের জন্য তৃষিত থাকলেও তা সে পায়নি। তপস্বীর ঔরসজাত সন্তানের মা হওয়া ছাড়া তার দাম্পত্যের আর কোনো মাধুর্য নেই। দাম্পত্য সম্পর্কের প্রধান ভিত্তি পারস্পরিক আকর্ষণ আর এই আকর্ষণের মূল উপাদান প্রীতি, প্রেম ও প্রয়োজন। জরৎকারু ও অস্তিকার দাম্পত্যের সূচনা হতেই পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ ছিল শূন্য। শুধুমাত্র নিজেদের প্রয়োজনে তারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। ফলে প্রীতিহীন সম্পর্ক হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য জগৎকারু ছিল উদ্‌গ্রীব। তাই অস্তিকার আচরণের যৎসামান্য দুর্বলতায় জগৎকারু তাকে ছেড়ে যেতে প্রস্তুত হয়। তাকে সন্তানবতী করে জরৎকারু বিদায় নিলে তাদের দুজনের স্বার্থই সিদ্ধিলাভ করলেও অস্তিকা তার লাঞ্ছিত নারীত্ব নিয়ে একাকি হয়ে পড়ে। অস্তিকা অনুভব করে, 'স্বামীহীন এক সংসারের নিকেতনে আজীবন শূন্যতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর জীবন। আর নির্বাপিত সন্ধ্যাদীপের আঁধারে ঐ যে মসীময় অবলেপ, ঐ তো তার অপমানিত নারীত্বের শ্মশানধূমলেখা! শুধু অপমান, শুধু ব্যর্থতা ও অগৌরব।' (১৪১৯ : ১৯০)। যেকোনো পরিস্থিতিতে নারীর আত্মদানের ত্যাগী মানসিকতাকে ধারণ করে অস্তিকা *ভারত প্রেমকথার* বেদনাবহ নারী চরিত্রে রূপায়িত হয়েছে। তার আত্মদানে প্রাপ্ত অগৌরব পাঠককে ভাবায়, কাঁদায়।

জনক ও সুলভা উপাখ্যানে সুলভা আত্মজ্ঞনী সেই সঙ্গে আদর্শবাদীও। নর-নারীর সম্পর্কে কামনা-বাসনা রহিত মনোভাবকে সুলভা প্রাধান্য দেয়। নারী পুরুষের ছায়াসঙ্গিনী– এমন ভাবতে সে প্রস্তুত নয়। বিদেহরাজ জনককে পাওয়ার আশায় তিনবার স্বয়ংবর সভা পণ্ড করে দশবছর ব্যাপী সাধনা করে সুলভার আত্মজ্ঞান জন্মেছে। তাই সে মোক্ষতত্ত্ববাদী নিষ্কাম মিথিলার রাজা জনককে পরীক্ষা করে দেখার নিমিত্তে এক মনোরম রূপ ধারণ করে তার রাজসভায় উপস্থিত হয়ে যোগবলে নিজের বুদ্ধি ও দৃষ্টিশক্তি জনকের বুদ্ধি ও চোখে সন্নিবিষ্ট করে। জনক সুলভার মুখোমুখি হয়ে জানায় যে, সে আসক্তি ও মোহ হতে মুক্ত হয়েছে। তার উপলব্ধিতে ধরা পড়েছে যে, অর্থ নয়, জ্ঞানই মোক্ষলাভের একমাত্র মাধ্যম। তবে রাজা জনকের মোক্ষলাভের তুষ্টিতে কম্পন সৃষ্টি হয় সুলভার চোখের দৃষ্টিতে; সে বিচলিতবোধ করে। নারী-পুরুষ সকলকে সমানভাবে দেখার যে আত্মবিশ্বাস তার জন্মেছিল তাতে চিড় ধরে সুলভার মোহচ্ছবিতে। তাই রাজা জনক নিজের পদস্খলন হওয়ার পূর্বেই সুলভাকে রাজ দরবার হতে চলে যেতে অনুরোধ করে, কারণ, 'তাঁর বাসনাবর্জিত চিত্তের শূন্য গহনে, কামনাময় পরাগধূলির ঝটিকা সঞ্চারিত করেছে এই নারী।' (১৪১৯ : ১৯৭)। কিন্তু সুলভাতো রাজা জনকের আত্মতুষ্টির সত্য-মিথ্যাকে চিহ্নিত করতে এসেছে। জনক যদি সত্যিই জীবন্মুক্ত না হয়, তাহলে সুলভার স্পর্শে তার দেহে কামনাভাব জাগ্রত হবে না, সে রাজাকে অনুবোধ করে,

> সুলভা– আপনার বক্ষের সান্নিধ্য চাই।
> চমকে ওঠেন জনক। আমার বক্ষের সান্নিধ্য?
> সুলভা– হ্যাঁ নৃপতি জনক। আপনার বক্ষের স্পর্শ নয়, শুধু সান্নিধ্য। [...] বুঝতে পারবে; তোমার এই মোক্ষব্রতকঠিন অন্তরের কোনোখানে বাসনার অবলেশ আছে কিনা-আছে। (১৪১৯ : ১৪৯৯)

সুলভার এই পরীক্ষায় জনক তার মোক্ষব্রতের মিথ্যা সন্তুষ্টিকে আবিষ্কার করতে সমর্থ হলে সুলভা জনককে লিঙ্গ পরিচয়ের উর্ধ্বে উঠে সাধনা চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেয়।

প্রকৃতির অন্যান্য প্রাণীর মতো মানুষের মিলনের কোনো নির্দিষ্ট ঋতু নেই। মানুষই একমাত্র জীব, যার যৌনাকাঙ্ক্ষা তার নিজস্ব দৈহিক সত্তার মধ্যেই সঞ্চিত থাকে। উপরন্তু, মানুষ তার এই কামনা বাসনাকে প্রশমিত করতে সক্ষম, সে তা নিয়ন্ত্রণও করতে পারে। কামনার উদ্দীপনা নির্বাপিত করে নর-নারী পরস্পরের সহজ সান্নিধ্যে বন্ধুত্বের উজ্জ্বলতায় উদ্ভাসিত হতে পারে। জ্ঞানের আলোকবর্তিকায় কামনার তীব্রতা নির্বাপণ করতে পারলেই ব্যক্তির মোক্ষলাভ ঘটে। (পার্থ চট্টোপাধ্যায় ২০২৩ : ১৬৬)। সুলভাও এই আদর্শকে ধারণ করে রাজা জনকের মোহমায়ার কাঁটাকে ভেঙে দিয়ে, তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধুতে পরিণত হয়েছে এবং 'এক পরম অন্বেষার সাধনায় দুটি জীবনের ভ্রমজয়ের প্রশান্ত আনন্দ বান্ধব আর বান্ধবীর মত দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।' (১৪১৯ : ২০৩)। নরনারীর দেহাতীত সম্পর্কের পবিত্র বন্ধুত্বকে ধারণ করে সুলভা আত্মজ্ঞান ও আদর্শে উদ্ভাসিত হয়েছে।

সন্তানের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র মা। মা এমন একটি শব্দ যেখানে স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা, ত্যাগ ও শক্তির সম্মিলন ঘটে। সাহিত্য বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা তথা উপন্যাস, গল্প, কবিতা ও নাটকে মা চরিত্রের নানামুখী রূপ ও ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে। *ভারত প্রেমকথা*ও এর ব্যতিক্রম নয়। আলোচ্য গল্পগ্রন্থের বিভিন্ন উপাখ্যানে নারীর মধ্যে মায়ের গভীর ও চিরন্তন রূপ প্রতিভাত হয়েছে। লপিতা, পৃথা, শুক্তিমতী ও পুলোমার মাধ্যমে মাতৃত্বের নানারূপ দেখা যায়। যেমন: *মন্দপাল ও লপিতা* গল্পে লপিতা নিজে সন্তান ধারণ না করেও সপত্নীর ছেলেদের অসম্ভব ভালোবাসে। মন্দপালের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের শাস্তি দিতে এসে তার চার ছেলের মুখ দেখে লপিতা তাকে ক্ষমা করে দেয়। পরম স্নেহে লপিতা মন্দপাল-জরিতার সন্তানদের আলিঙ্গন করে বাৎসল্য রস অনুভব করে। মহিমান্বিত মাতৃমূর্তির কাছে আসঙ্গপ্রিয় লপিতাও পরাজয় স্বীকার করে। *ভাস্কর ও পৃথা* গল্পে আবেগের বশবর্তী হয়ে দেব ভাস্করের সঙ্গ কামনার ফল পৃথাকে ভোগ করতে হয় কুমারী জীবনের সম্মান নাশ করে সন্তানবতী হওয়ার মাধ্যমে। পৃথা যখন প্রথমবারের মতো মা হয়, তখন সে এক নতুন ধরনের আবেগের মুখোমুখি হয়। তার মধ্যে এক অদ্ভুত পরিবর্তন আসে– সন্তানের জন্য ভালোবাসা, ভয়, আশঙ্কা সর্বোপরি অপরিসীম মায়ার অনুভূতি জাগ্রত হয়। অনাকাঙ্ক্ষিত সন্তানকে ভাসিয়ে দিতে হবে জেনে পৃথার মাতৃত্ব আর্তনাদ করে ওঠে, 'প্রগলভ কৌতুকিনী নয়, যার শূন্যবক্ষের যাতনা অশ্রুস্রোত হয়ে জলপদ্মের বনে ঝড়ে পড়ছে। (১৪১৯ : ১০৭)। সন্তান ত্যাগের নিঃশব্দ কান্নার ভার বহন করে কিশোরী পৃথার মাতৃত্ব আর্তনাদ করে ফিরেছে। পরিচয়হীন সন্তানকে নিজের কাছে রাখবার সাহস পৃথার না থাকলেও *মহাভারতে*র 'বসুরাজ ও গিরিকা' গল্পের শুক্তিমতী সে স্পর্ধা দেখাতে সমর্থ হয়েছিল। দস্যুস্পর্শে অবাঞ্ছিত সন্তানকে রাজা বসুরাজ কর্তৃক বিলোপের প্রস্তাব পেলেও শুক্তিমতী তা মেনে নেয়নি। দস্যুর লালসার সৃষ্টিকে ঘৃণা করতে না পেরে তাকে বাঁচাবার জন্য রাজার সঙ্গে তর্ক করে শাস্তিকে মাথা পেতে নিয়েও শুক্তিমতী সন্তানকে রক্ষা করেছে। অনিষ্ট হতে সন্ততিকে রক্ষার বৈশিষ্ট্যে শুক্তিমতীর মাতৃত্ব বিশিষ্টতা অর্জন করেছে।

ভৃগু ও পুলোমার দাম্পত্যে ভালোবাসা না থাকায় অন্তঃসত্ত্বা পুলোমা তার প্রাক্তন প্রেমিকের অনুগামী হতে গিয়েও হতে পারেনি শুধুমাত্র অনাগত সন্তানের কথা চিন্তা করে। মা পুলোমার সম্মুখে প্রেমিক পুলোমার অস্তিত্ব বিলীন হয়েছে। কারণ পুলোমা তার সন্তানকে প্রকৃত পিতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত করতে চায়নি। অপমানিত হবে জেনেও সন্তান জন্ম দিয়ে পুলোমা স্বামীগৃহে ফিরে আসতে চেয়েছে। কারণ শিশুপুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে পুলোমা উপলব্ধি করে, মায়ের পরিচয়কে স্বেচ্ছাচারিতায় হারানোর শক্তি তার নেই। কেবল পুত্রের জন্য আর্য নারীর পরিচয়কে মাথা পেতে নিয়ে পুলোমা বলে, 'ভার্গবের মাতা হবার গৌরব নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই, আর কিছু চাই না।' (১৪১৯ : ১৭১)। আলোচ্য গল্পে সন্তানের জন্য পুলোমার আত্মত্যাগ তাকে শক্তি ও মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে।

ভারত প্রেমকথা গ্রন্থের 'সংবরণ ও তপতী' গল্পের তপতী চরিত্রটিতে সুবোধ ঘোষ প্রাচীন ভারতীয় নারীর আদর্শকে আধুনিক দৃষ্টিতে উপস্থাপন করেছেন। ভগবান আদিত্যের কন্যা তপতী বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমতী। তার পিতার সমদর্শিতার নীতিকে সে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে একই চেতনায় বিশ্বাসী রাজা সংবরণকে সে স্বামী রূপে গ্রহণ করেছিল। তাদের দাম্পত্যের প্রেমে তারা উভয়েই নিজেদের দায়িত্ব ভুলে আত্মসুখে মগ্ন হওয়ায় রাজ্যে অরাজকতা দেখা দেয়। তপতী চরিত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তটি আসে যখন সে বুঝতে পারে যে, সংবরণ শুধু স্বামী নয় রাজাও, সে শুধু সংবরণের স্ত্রী নয়, বরং রাজ্যের রাণী ও লোকমাতা। এই বোধে জাগ্রত হয়ে তপতী সংবরণকে সত্যের মুখোমুখি করে। তপতী যখন বলে তাদের বিয়ে শুধু নিজেদের আনন্দের জন্য হয়নি, হয়েছে জগতের আনন্দের জন্য, তখন সংবরণ নতুন করে শুনতে পায়, 'সংসারের মানব ও মানবীর জীবন মিলিত হয় সমাজকল্যাণের নূতন মন্ত্ররূপে, সংকল্পরূপে, ব্রতরূপে, যজ্ঞরূপে! তারই নাম বিবাহ। শুধু নিজের জন্য নয়, নিভৃতের জন্যও নয়, জগতের জন্য। (১৪১৯ : ১০০)। তপতী নিজের ও সংবরণের মধ্যে সমদর্শিতাকে শুধু তত্ত্ব রূপে গ্রহণ করেনি, বরং তাদের জীবনযাত্রা ও মানসিকতায় সমদর্শিতাকে গভীরভাবে প্রোথিত করেছে। তপতীর মধ্যে আধুনিক নারী চেতনার প্রতিফলনও লক্ষ করা যায়। তপতীর, 'তপতী কোনো পুরুষের শুধু আসঙ্গবাসনার উপবননিভৃতের প্রমোদসঙ্গিনী হতে পারে না।' (১৪১৯ : ৯১)– এই বক্তব্য তাকে একজন সচেতন আধুনিক নারী হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত করে। তাই পুরাতন কাহিনির কাঠামো ধারণ করেও তপতী আধুনিক পাঠকদের কাছে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

বহুগামীতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে একমনুষ্যপ্রীতির ধর্মকে ধারণ করে চিরকালীন প্রেম ও আনুগত্যকে বিশ্বাস করে এক উজ্জ্বল চরিত্রে পরিণত হয়েছে *অগ্নি ও স্বাহা* গল্পের নারী চরিত্র স্বাহা। প্রজাপতি দক্ষের কন্যা স্বাহা অগ্নিদেবের উদ্দেশ্যে গভীর প্রণয় অনুভব করে। পদ্মপত্রে লেখা তার চিঠি অগ্নিদেবের চলার পথে সে বহুবার ছড়িয়ে দিয়েছে, 'অগ্নিকে ভালোবেসেছে ঐ মেঘবর্ণ দক্ষভবনের মেয়ে স্বাহা'। (১৪১৯ : ১০৯)। কিন্তু অগ্নি তার ভালোবাসাকে প্রত্যাখ্যান করে। কারণ স্বাহার প্রেম একনিষ্ঠ, অপরদিকে অগ্নি একজন নারীর প্রেমে আবদ্ধ হতে রাজি নয়। সে চায় বহুবিধ আনন্দ উপভোগ করতে। তাই স্বাহার আহ্বান তার কাছে বাধা বলেই মনে হয়। যেমন:

> স্বাহা– ভালোবাসা মধুপের ফুলবিলাস নয়। এক হতে অন্য জন, নিত্যনব অভিসার আর
> বল্লভসন্ধান নারীর প্রেমের রীতি নয়, নারীর ধর্মও নয়।
> ঈষৎ ভ্রুকুটি করেন অগ্নি– নারীর ধর্ম কি?
> স্বাহা– একপুরুষপ্রীতি।
> অপ্রসন্ন হয়ে ওঠেন অগ্নি। কি হিংস্র এক ধর্মতত্ত্বের কথা এত শান্তভাবে বলে চলেছে স্বাহা।
> [...]
> স্বাহা– শুধু নারীর ধর্ম কেন, পুরুষের ধর্মও যে তাই।
> অগ্নি বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করেন– কি?
> স্বাহা– একনারীপ্রীতি। (১৪১৯ : ১১১)

উল্লিখিত দৃষ্টান্ত হতে সহজেই অনুমেয় যে, স্বাহা একনিষ্ঠ প্রেমের ভক্ত। তাই স্বাহার প্রেম অগ্নির কাছে বন্দিত্বের প্রতীক হয়ে ওঠে। তাই সপ্তঋষির গৃহে যজ্ঞের আমন্ত্রণ পেয়ে অগ্নি স্বাহাকে ত্যাগ করে সেখানে গমন করে সপ্ত ঋষিবধূকেই কামনা করে। তার এই কামনার অনল তাকে বন্দি করে রাখলেও অগ্নি তা বুঝতে অসমর্থ হয়। কারণ, 'নারীকে প্রেমিকারূপে নয়, শুধু দাহিকারূপে লাভ করবার জন্য যে পুরুষের তৃষ্ণা আকুল হয়ে রয়েছে, সে বুঝবে কি করে, ক্ষতি কোথায়?' (১৪১৯ : ১১৩)। অগ্নিও তার নিজের ক্ষতি বুঝতে পারেনি। প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়েও স্বাহাই তার প্রেমিক অগ্নিকে কলুষ হতে রক্ষা করতে এগিয়ে আসে। অগ্নিকে বাঁচাতে স্বাহা তার জীবনের সবচেয়ে জটিল পরীক্ষার মুখোমুখি হয়ে

নিজের সম্মান ত্যাগ করে সপ্তর্ষির স্ত্রীর রূপ ধারণ করে ছয় বার অগ্নির কাছে নিজেকে সমর্পণ করে। এই কারণে *মহাভারতে* সপ্তর্ষিগণের ছয়পত্নীকে মিথ্যে অপবাদও দেওয়া হয়। যেমন: 'বনবাসীরা কহিত, এই ছয় ঋষিপত্নীই ষড়াননের প্রসূতি।' (কালীপ্রসন্ন সিংহ ২০২৪ : ৬২৩)। স্বাহা প্রবঞ্চক নয়। তাই সে সত্য উদ্‌ঘাটন করে কৃতকর্মের দায় মাথা পেতে নিয়েছে। স্বাহা চরিত্রের পুনর্নির্মাণকারী সুবোধ ঘোষ প্রেমে আত্মহারা নারীর আত্মবিনাশী রূপের চিত্র উপস্থাপনে আগ্রহী নন। তাই সপ্তমবারে স্বাহার আত্মসম্ভ্রমবোধ জাগ্রত হয়। স্বাহা বুঝতে পারে, এই নীতি প্রেমিকার নীতি নয়। তাই, 'কেঁদে ফেলে স্বাহা। এমন করে কোনোদিন কাঁদেনি স্বাহা। এত স্পষ্ট ক'রে নিজের ভুল আর ক্ষতিকে কোনোদিন বুঝতে পারেনি।' (সুবোধ ঘোষ ১৪১৯ : ১১৬)। এই বোধ জাগ্রত হওয়ার কারণে কুমারীমাতৃত্বের ভার কাঁধে নিয়ে স্বাহা অগ্নিকে ত্যাগ করে। ভূলুণ্ঠিত আত্মমর্যাদা পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে প্রেমিককে ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার মাধ্যমে স্বাহা আধুনিক নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতীকে রূপায়িত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, *মহাভারতে* স্বাহার উপস্থিতি ক্ষণকালের জন্য হলেও সুবোধ ঘোষ তাকে বিস্তৃত পরিসরে চিত্রিত করে অগ্নি অপেক্ষা স্বাহার দীপ্তিকে অনির্বাণ করেছেন।

স্বাহার চরিত্রে একদিকে যেমন প্রেমের একনিষ্ঠবোধ প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে আধুনিক নারীর আত্মসম্মান, আত্মবিশ্লেষণ, নৈতিকতা ও ব্যক্তিত্ববোধের দীপ্ত প্রকাশ ঘটেছে। সুবোধ ঘোষের বর্ণনায় প্রেম, আত্মত্যাগ ও আত্মমর্যাদাবোধের ভারসাম্য রক্ষার মাধ্যমে স্বাহা আধুনিক নারীত্বের অনন্য প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

দেবশর্মা ও রুচি গল্পে রুচি স্বাহার বিপরীতে অবস্থিত, যদিও পরে সে বুঝতে পারে যে, বাসনার কারণে বহুগমনে তৃপ্তি নেই, বরং হৃদয় দিয়ে ভালোবাসার মাধ্যমেই প্রকৃত মুক্তি বিদ্যমান। রুচি প্রথমে পরপ্রণয়িনী রূপে পুরন্দর ও বিপুলের মায়ায় আবদ্ধ হয়ে অনুভব করতে পারে, প্রকৃত প্রেম শুধুমাত্র রূপ-যৌবনের আকর্ষণে নয়, বরং অন্তরের গভীর অনুভূতির উপলব্ধিকরণে ও সহমর্মিতায় নিহিত। রুচির বিদ্রোহ হতে আত্মনির্ণয়ের যাত্রা একজন নারীর আত্মোপলব্ধির গল্প যা আজও প্রাসঙ্গিক।

ভারত প্রেমকথা গ্রন্থের নারী চরিত্রসমূহের বিনির্মাণে সুবোধ ঘোষের মুন্সিয়ানা পরিলক্ষিত হয়। সমগ্র *মহাভারত* জুড়ে রয়েছে অসামান্য নারী চরিত্রের ব্যাপ্তি। সমালোচক জানিয়েছেন, 'মহাভারতে যে সকল নারীচরিত্রের সহিত আমাদের সাক্ষাত পরিচয় ঘটে, কেবল নারীত্বের মধ্যে তাহাদের পরিচয় সীমাবদ্ধ নহে, পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের মধ্যে তাহাদের পরিচয়। তাঁহাদের পূর্ণতা ও মহিমা অতি উচ্চ ধরনের। (তপন মণ্ডল ২০০৭ : ৯৬)। সুবোধ ঘোষের *ভারত প্রেমকথার* গল্পগুলো পাঠ করলে উল্লিখিত বক্তব্যের নির্নিমেষ উত্তরণ অনুভূত হয়।

ভারত প্রেমকথার অমূল্য সম্পদ হিসেবে নারীচরিত্রের জীবনানুভূতি, সহিষ্ণুতা, বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন মনোভাব, মানসিকতার দাঢ্য এবং নিজস্ব চারিত্রিক দৃঢ়তায় অবিচল থাকার গুণাবলী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মহাকাব্য *মহাভারতে* যেসব নারীচরিত্র স্বল্পজ্ঞাত ও অজ্ঞাত কিন্তু স্বাতন্ত্র্য উজ্জ্বল, সুবোধ ঘোষ তাদের কথাকেই আলোচ্য গ্রন্থে অন্তর্ভূক্ত করেছেন। এই বিশাল কাহিনির বহমানতায় তাদের অবদান থাকলেও প্রধান চরিত্রের গৌরবে তাদের কথা আড়ালেই রয়েছে। লেখক সেই সব অনালোচিত নারী চরিত্রসমূহের ওপর আলোকপাত করে তাদের অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ দৃষ্টিগোচরে এনেছেন। আলোচ্য গ্রন্থের গল্পসমূহের নারী চরিত্রগুলো বিশ্লেষণে বলা যায় যে, মহাভারতীয় কালের মেয়েদের মর্যাদা, স্বাধীনতা ও দৃঢ়তা অনেক বেশি ছিল। নারীশক্তির এক সম্মিলিত সুর তাদের মধ্য হতে ধ্বনিত হয়, যা তাদের শক্তিময়ী ও পরমা করে তোলে। সুবোধ ঘোষের পুনর্নির্মিত নারীচরিত্র গুলোতে সামসময়িক নারী জীবনের জটিলতার প্রতিফলন ঘটেছে। আলোচ্য গবেষণায় দেখা যায় যে, লেখক *মহাভারতের* নারীকে কেবল প্রেমের বস্তু হিসেবে চিত্রিত করেননি, বরং তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও আত্মিক শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। আলোচ্য গল্পগ্রন্থের কয়েকটি গল্পে মাতৃত্বকে নারীজীবনের কেন্দ্রীয় শক্তি হিসেবে উপস্থাপন করার পাশাপাশি মাতৃত্বের চিরন্তন রূপও এখানে উদ্ভাসিত হয়েছে। এছাড়াও নারীর

প্রেম ও দাম্পত্য জীবনের দ্বন্দ্ব, বিয়ের বিষয়ে ও সঙ্গী নির্বাচনে তার স্বাধীন মনোভাব, আত্মত্যাগ, ক্ষমা, শ্রদ্ধা ইত্যাদি মানবিক ও সামাজিক মূল্যবোধও আলোচ্য গল্পগ্রন্থের নারীদের মধ্যে লক্ষ করা যায়।

ভারত প্রেমকথা গল্পগ্রন্থের বিভিন্ন নারীচরিত্রগুলো তাদের আবেগ, অনুভূতি, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং পারিপার্শ্বিক সম্পর্কের অভিজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমে তাদের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছে। সুবোধ ঘোষের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি হতে উদ্ভূত সুশোভনা, গুণকেশী, লোপামুদ্রা, পিঙ্গলা, লপিতা, তপতী, পৃথা, স্বাহা, মাধবী, প্রমদ্বরা, ভাস্বতী, পুলোমা, সুকন্যা, শুক্তিমতী, সুলভা, রুচি, শ্রুবাবতী নামক নারীরা স্বাধীন চিন্তা-চেতনায়, আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মানের অনুভবে, বুদ্ধিমত্তায়, মাতৃত্বের অনন্য অনুভূতিতে, সংগ্রামী মানসিকতায় বাংলা ছোটগল্পধারায় মুক্ত ও আধুনিক নারী প্রতীকে চিহ্নিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র

অরিন্দম গোস্বামী (২০০১), *সুবোধ ঘোষ : কথাসাহিত্য*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

কালীপ্রসন্ন সিংহ (২০২৪), *মহাভারত* (১ম খণ্ড), অক্ষয় লাইব্রেরী, কলকাতা

(২০২৪), *মহাভারত* (২য় খণ্ড), অক্ষয় লাইব্রেরী, কলকাতা

তপন মণ্ডল (২০০৭), *গল্পকার সুবোধ ঘোষ : জীবনদৃষ্টি ও নির্মাণ শিল্প*, জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী, আগরতলা

নীরদচন্দ্র চৌধুরী (১৪২৬), *বাঙালী জীবনে নারী*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা

পার্থ চট্টোপাধ্যায় (২০২৩), *বাঙালি জীবনে সম্পর্ক*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

প্রমথনাথ বিশী (১৪১৯), 'বাংলা সাহিত্যে ক্লাসিকাল রস', *ভারত প্রেমকথা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯৯৯), *বঙ্কিম রচনাসমগ্র* (১ম খণ্ড), ক্যাবকো, টাঙ্গাইল, ঢাকা

মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় (২০১৫), '*মহাভারতের* স্বল্পালোচিত নারী চরিত্র, *এবং আমরা* (সম্পাদক: মহুয়া ভট্টাচার্য), মধ্যগ্রাম, কলকাতা

সুবোধ ঘোষ (১৪১৯), *ভারত প্রেমকথা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

(১৯৯৬), 'নতুন করে পাবো বলে', *বিচিন্তা : সাহিত্য সংস্কৃতি*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

[**Abstract:** Subodh Ghosh, one of the most gifted fiction writers and journalists in Bengali literature, has secured a distinctive place in the minds of readers through his unique narrative style and original creative power. His emergence in Bengali literature was both sudden and striking. As one of the brightest talents of the post-Kallol era, Ghosh masterfully blended his diverse life experiences with sharp observational insight to produce a remarkable body of literary work. His book *Bharat Premkatha* stands out as a significant contribution to Bengali fiction, where several lesser-known narratives from the *Mahabharat* are reimagined through a renewed, contemporary consciousness. In this book, while retaining the core essence of the original stories, Ghosh reinterprets them with an emphasis on psychological complexity, human conflict and the autonomous

consciousness of women. The vivid portrayal of female characters in this work, along with the distinctiveness of their personalities, calls for deeper scholarly exploration. Taking this into account, the primary objective of the present research is to analyze the uniqueness of Subodh Ghosh's female character construction in *Bharat Premkatha* and to evaluate their relevance within a modern context.]